৫

তারিখ 24 JUL 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

দৈঃ জনকণ্ঠ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন হবে কি?

আমাদের দেশে গত দু'দশক ধরে শিক্ষাঙ্গনে অসংখ্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। খুন হয়েছে অনেক শিক্ষার্থী। যারা খুনী তারা শিক্ষাঙ্গনে বিচরণ করছে সদম্ভে। কর্তৃপক্ষ জানলেও তার কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। বলা যায়, ক্ষমতাসীন সরকারের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে সন্ত্রাসী ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেনি। কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। ছিল না প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। দিনে দিনে ছাত্র সন্ত্রাস ব্যাপকতা লাভ করে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ন্যুব্জ করে দেয়। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের ব্যাপারটি শুধুই আনুষ্ঠানিকতার বিষয়ে পরিণত হয়। নকল ধরতে গিয়ে শিক্ষককে প্রহৃত হতে হয়েছে। ছুরিকাঘাতের ঘটনা কম নয়। ছাত্রের হাতে

এম আর গাজ্জালী

খুন হয়েছে এমন দৃষ্টান্তও আছে বেশ ক'টি। বোমাবাজি, গুলির ঘটনা তো হরহামেশা ঘটছেই। কিন্তু সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও দেশের সাধারণ মানুষ এ অবস্থার অবসান চাইছে। ঠিক সেই সময় প্রত্যাশার নতুন সূর্য উদয় হয় ১১ জুলাই। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ পরিষদের এক সভায় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ক্যাম্পাসে অছাত্র, অবৈধ অস্ত্রধারীদের আনাগোনা বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। দেশের সাধারণ মানুষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। ছাত্র নেতৃবৃন্দের এই উদ্যোগকে সবাই ধন্যবাদ জানান।

দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে বসে ছাত্র নেতৃবৃন্দ দেশপ্রেমের যে উদাহরণ সৃষ্টি করলেন, তাকে খাটো করার কোনই সুযোগ নেই। বিলম্বে হলেও ছাত্ররা বুঝতে পেরেছেন শিক্ষা হলো দরিদ্র দেশের মানুষের বড় পুঁজি। এই পুঁজিকে ধ্বংস করা মানে দেশকে ধ্বংস করা। যে কোন সমাজ কিংবা জাতির শ্রেষ্ঠ শক্তি হচ্ছে সেই সমাজ বা জাতির ছাত্র সমাজ। তাদের কর্মপ্রয়াস ও জ্ঞান-গরিমা দেশকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়। উন্নত বিশ্বের দিকে তাকালে সে কথারই প্রমাণ মেলে। আমাদের ছাত্রসমাজ কেন আজ সন্ত্রাসের পথে পা বাড়িয়েছে? উত্তর সবাই জানি। রাজনীতিকরা দলীয় স্বার্থ রক্ষায় ছাত্রদের দাবার ঘুঁটির মতো ব্যবহার করছেন। ছাত্ররা রিমোট কন্ট্রোলে চলছে। কিন্তু ধ্বংস হচ্ছে জাতির ভবিষ্যত আশা-আকাঙ্ক্ষা। আমরা ছাত্র নেতৃবৃন্দের ন্যায় দেশের রাজনীতিকদের কাছ থেকেও অঙ্গীকার আশা করছি। দেশ আজ গণতান্ত্রিক রীতিনীতি সম্বল করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমাদের একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। এমনিতেই আমরা দরিদ্রতম জাতি। তার ওপর শিক্ষা-দীক্ষায়ও যদি ক্রমান্বয়ে দুর্বল অবস্থানে উপনীত হই তাহলে ১২ কোটি মানুষ অদূর ভবিষ্যতে সোমালিয়ার জনগণের মতো ভাগ্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে। সুস্থ বিবেকসম্পন্ন কোন মানুষ এ ধরনের পরিস্থিতি প্রত্যাশা করেন না। দেশে আজ ক্ষমতার হাত বদল হয়েছে অস্ত্রশক্তির মাধ্যমে নয়, জনগণের সম্মতির ভিত্তিতে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায়। সুতরাং গণতন্ত্র ও সন্ত্রাস পাশাপাশি চলতে পারে না। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্যে তাই রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া অপরিহার্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতৃবৃন্দ সেই উদারহণ সৃষ্টি করেছেন। ঐকমত্যের যে স্বপ্নসৌধ তাঁরা তৈরি করেছেন তা যেন সামান্য ঘটনায় ভেঙ্গেচুরে না যায়, সেদিকটায় দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। নেতৃবৃন্দ যদি শুধুই সংবাদ সৃষ্টির জন্যে, সংবাদ শিরোনাম হওয়ার জন্যে কিংবা সস্তা বাহবা কুড়ানোর জন্যে ঠুনকো অঙ্গীকার ব্যক্ত করে থাকেন তাহলে তা হবে নিদারুণ মনোকষ্টের ও দুঃখ-পরিতাপের বিষয়। বাংলাদেশ কখনও ভাল কোন দৃষ্টান্ত দেখলে স্বপ্ন দেখে। ছাত্র নেতৃবৃন্দের ঐকমত্যের দৃষ্টান্তে বাংলাদেশের হৃদয় সানন্দে নেচে উঠেছে। এদেশের ছাত্র সমাজ বার বার জনগণকে আন্দোলিত করেছে। বহু আন্দোলনের অগ্রপথিক এই ছাত্র সমাজ। দেশের মানুষ তাদের হাতে বই, খাতা, কলম দেখতে চায়। শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত হোক— সকলের এই একই প্রত্যাশা। বিশাল ঐতিহ্যের অধিকারী ছাত্র সমাজ টেন্ডার, হলের সীট, ডাইনিং-এর খাবার বা সামান্য কথা কাটাকাটির সূত্রে সহপাঠির বুকের রক্তে হাত রঞ্জিত করেছে। ১১ জুলাই ছাত্র নেতৃবৃন্দ অঙ্গীকার করেছে, যে কোন সমস্যার সমাধান আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে করবেন। আমরা তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন দেখতে চাই। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সরকার ও বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ থাকার সুযোগ সৃষ্টি করবেন। বড় অসহায় এদেশ, এদেশের ১২ কোটি মানুষ। একমাত্র সম্বল শিক্ষা ও ছাত্র সমাজ। তাই এ দুটোর সহাবস্থান বড়ই প্রয়োজন।

শিক্ষার সুন্দর পরিবেশ ঝড়-বাদলকেও হার মানায়